

কোয়ান্টাম মেথড একটি লাইফ জ্যাকেট ড. এ কে এম শহীদুল্লাহ



কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয় ১০ বছর আগে, সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড বইটি পড়ে। পরবর্তীতে আমার রোল মডেল প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের একটি লেখাও আমাকে কোয়ান্টাম সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু পড়াশোনা ও বিদেশে চাকরি ইত্যাদি নানা ব্যস্ততায় এতদিন কোর্সটি করা হয়ে ওঠে নি।

সম্প্রতি আমার মা ইস্তেকাল করেছেন, যে কারণে আমি দেশে এসেছি। আমি মায়ের বড় ছেলে, মায়ের মৃত্যুতে মনটা খুব খারাপ ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট দেখে কোর্সের তারিখ জানতে পারলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম—এবারই করব।

এ কোর্সটি আমার জন্যে একটি আশীর্বাদ। আমার মায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ সবসময় আমার জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে। ঠিক তেমনি এবারও যেন মা আমাকে দেশে ডেকে এনে বললেন—“কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করো”। মা আমাকে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদটা দিয়ে গেলেন।

বাস্তব জীবন সত্যিই কঠিন। একে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে হলে কিছু কৌশল জানতে হবে। কোয়ান্টাম মেথড আমাদের সেই কৌশলগুলোই আয়ত্ত করতে শেখায়। চার দিন পর আজ মনে হচ্ছে, ঝঞ্ঝাবিষ্কৃত জীবন নদীতে যদি বাড় ওঠে তবু আমাকে ডুবে যেতে হবে না, কারণ কোয়ান্টাম আমাকে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে। এ কোর্স সত্যিই একটি লাইফ জ্যাকেট।

[অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়ার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. এ কে এম শহীদুল্লাহ কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৬৩ ব্যাচের প্রত্যয়নে একথা বলেন।]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৪ তম কোর্স

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : আইডিবি, কাকরাইল, ঢাকা



মুক্ত আলোচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান
মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া

নৈতিকতার চর্চাই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার



বাংলাদেশ আজ অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বর্তমানে এশিয়াতে সর্বোচ্চ, প্রায় আট শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, আমাদের জাতীয় আয় ও জাতীয় বাজেটের পরিমাণও প্রতিবছরই বাড়ছে। অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটছে, এখন এ অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে বেশি যা দরকার সেটা হলো শান্তি, বিনয়, পরমতসহিষ্ণুতা, সেবা ও নীতি-নৈতিকতার চর্চা। এটা শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে, নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে। আর বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বহুদিন ধরে এর চর্চা করে আসছে। বলা যেতে পারে, সেবা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম।

গত ৭ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯৩ তম পর্বে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি।

ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শ্রোতা-দর্শক হিসেবে অংশ নেন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীসহ কোয়ান্টাম পরিবারের তিন শতাধিক সদস্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া আরো বলেন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের আমি দেখেছি—তারা নিজেরা যেমন সুস্থ ও ভালো থাকতে চান, তেমনি অন্যদেরও ভালো রাখার জন্যে কাজ করে যান। বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনকালে আমি লক্ষ্য করেছি—কীভাবে ছোটবেলা থেকেই আধুনিক শিক্ষায় ও সুস্থ সুন্দর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই শিশুরা বা তাদের পরিবারের কাছ থেকে কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, বরং এ-কাজটি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এই নিরেট সমাজসেবা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। আমি মনে করি, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কোয়ান্টামের পাশে থেকে তাদের ভালো কাজগুলো এগিয়ে নেয়া আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব।

লামার কোয়ান্টামমে নতুন সেবা উদ্যোগ

প্রবীণ সেবা ও দাফন কার্যক্রম

তৃষিত পথিকের জন্যে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম। এরপর থেকে গত দুই যুগে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরায়ন খাতে ফাউন্ডেশনের একাধিক সেবাপ্রকল্প—যার মধ্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবানের লামায় শুরু হচ্ছে ফাউন্ডেশনের নতুন দুটি সেবা উদ্যোগ—প্রবীণ সেবা ও দাফন কার্যক্রম।

আজ যারা প্রবীণ, কর্মক্ষমতা হারিয়ে বয়সের ভারে ন্যূজ কিংবা চলৎশক্তিহীন, তাদের শ্রমে-ঘামে গড়ে উঠেছে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র। স্বভাবতই তাদের কাছে আমরা খণী।



প্রবীণ সেবা কার্যক্রম

কিন্তু এদের অনেকেই নানা কারণে পার করছেন একাকী জীবন। অবহেলা আর প্রয়োজনীয় যত্ন ও মনোযোগের অভাবে কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ সময়।

এ প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নিয়েছে লামার কোয়ান্টামমের চারপাশে যেসব প্রবীণ নারী-পুরুষ স্বাভাবিক যত্ন ও পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবাটুকু পৌঁছে দেয়ার।

এ-ছাড়াও

কোয়ান্টাম পরিবারের সক্রিয় সদস্যদের অনেকেই এখন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন



দাফন কার্যক্রম

কোয়ান্টামমের জাবলে রাজিউন-এ সমাহিত হওয়ার। ফাউন্ডেশনও অন্তিম এ চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে সে সুযোগ করে দিতে চায় আগ্রহীদের।

আর উল্লিখিত দুটি সেবা উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন দক্ষ ও উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবক। তাই যারা কোয়ান্টামের হিসেবে এ দুটো সেবা কার্যক্রমে অংশ নিতে চান, তারা সংশ্লিষ্ট সেন্টার-শাখা-সেলে নাম জমা দিন। সেবা ও পরার্থপরতায় বরকতময় হয়ে উঠুক আপনার জীবন।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

পানিসম্পদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৭৩ তম পর্ব তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। 'বাংলাদেশের পানিসম্পদ II আমাদের করণীয়' বিষয়ে যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে হবে

অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত



যেখানেই যাই না কেন আমাদের পানি নিয়ে কথা বলতে হয়। অবশ্য এতে আমারও আত্মহারা কমতি নেই। অন্য প্রসঙ্গ শুনতে চাইলেও কথা শেষ করি পানি দিয়ে। আজও আমি পানিসম্পদ বিষয়ে কথা বলব।

অনেকের প্রশ্ন-পানির অপচয় করা ঠিক নয়, তবুও কেন আমরা সচেতন হই না? কারণ আমরা ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকি। ধারণা পরিষ্কার হলে আমরা সচেতন হতে পারব। শুধু পানিই নয়, জলবায়ু, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ইকোসিস্টেম-সবকিছু সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বাড়বে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে পানির পরিমাণ কিন্তু নির্দিষ্ট; অফুরন্ত নয়। এবার কল্পনা করি, পৃথিবীর সব পানি একটি বোতলে নেয়া হলো, যেখানে ১০০ চা-চামচ পরিমাণ পানি আছে। এখন পৃথিবীতে পানি বন্টন করতে হলে ৯৭ ভাগ চলে যাবে সমুদ্রে। লবণাক্ততার কারণে যা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। বাকি রইল তিন চামচ পানি। এর অর্ধেক ভূগর্ভস্থ পানি। বাকি অর্ধেক ভূপৃষ্ঠের ওপরের পানি-প্রবাহমান নদী ও স্থির বিল-পুকুর। হিসাব করলে দেখা যাবে, আমরা ব্যবহার করতে পারি মোট পানির মাত্র এক থেকে দেড় শতাংশ।

একজন অতি দরিদ্র মানুষের গল্প বলি। সে একসময় গ্রামে থাকত। তার গোসল করার প্রয়োজন হলে পুকুরে ডুব দিত। এতে কোনো পানি খরচ হতো না। পুকুরের পানি পুকুরেই থাকত। তার যেহেতু অভাব, সে শহরে এলো চাকরির সন্ধানে। নর্দমার পাড়ে একটি বস্তিতে উঠল। সেখানে পানির খুব অভাব, তাই তিন দিনে একবার সে গোসল করত। তারপর তার আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। বস্তির বাইরে টিনশেডের একটি ঘর ভাড়া নিল। গোসল করতে তার প্রয়োজন হতো এক থেকে দুই বালতি পানি। অবস্থা আরো ভালো হলো। তার বাথরুম এখন শাওয়ার আছে। গোসল করতে যদি দুই বালতি পানি লাগে, অতিরিক্ত তিন বালতি পানি শাওয়ার দিয়ে ঝরঝর করে পড়ে যায়।

এ উদাহরণটি শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যে-কোনো শহর বা দেশের অবস্থাও একইরকম। একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত ভালো হবে সেখানে পানির চাহিদাও তত বাড়তে থাকবে।

সকালে বা রাতে দাঁত মাজার সময় কি আমরা খেয়াল করেছি-কল ছেড়ে কতটা পানি অপচয় করি? পুরুষেরা শেভ করার সময় প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই পানি

বেশি খরচ করে। সারাদিনে একজন মানুষ হয়তো তিন লিটার পানি পান করছে, কিন্তু সে প্রতিবার টয়লেটে গিয়ে যখন ফ্লাশ করে, পাঁচ থেকে ছয় লিটারের মতো পানি একসাথে চলে যাচ্ছে। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মে আমাদের সচেতন হতে হবে। এমনকি গ্লাসে পানি ঢালার সময়ও এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে-অপচয় যেন না হয়। পানি এতটাই মূল্যবান সম্পদ।

ভূগর্ভস্থ পানি আমাদের ব্যবহার্য পানির অন্যতম একটি উৎস। এটাকে আমরা নিরাপদ মনে করি। কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি চুঁইয়ে নিচে যায়, তখন ফিল্টার হয়। কিন্তু যতটা পানি নিচে যাচ্ছে তার চেয়ে যদি আমরা বেশি পাম্প করে ওপরে তুলি, তাহলে পানির স্তর আরো নেমে যাবে। ঢাকা শহরে তা-ই হয়েছে। পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কাজেই ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে হলে দেখতে হবে, পানি তোলার জন্যে কতটা পুনর্নবন হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত পুনর্নবন কখনোই করা যাবে না।

গ্রাম-গঞ্জে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বসানো হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল। ফলে পানির স্তর সেখানেও নামতে শুরু করেছে। দিন দিন কমে যাচ্ছে পানির গুণগত মানও। বরেন্দ্র অঞ্চলে তো ভয়াবহ অবস্থা! বর্তমানে সেখানে আইন করে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে যেন নতুন কোনো ডিপ টিউবওয়েল বসানো না হয়।

এবার আসি নদী প্রসঙ্গে। নদীর পানির উৎস পাহাড়-পর্বত। পাহাড় থেকে বরফগলা পানি বা পাহাড়ি অঞ্চলে যে বৃষ্টি, সেটা নেমে নদী সৃষ্টি করে। পথে চলতে চলতে একটি নদী আরেকটির সাথে মিলে যায় এবং আকার বড় হতে থাকে। যেমন, মাওয়াতে যে পদ্মা নদীকে আমরা দেখি এটা লক্ষ নদীর সমাবেশের একটি রূপ। তাই প্রতিটি নদীর কিছু বিশেষত্ব আছে, তার গতিবিধিও অন্যদের চেয়ে আলাদা। একটির সাথে অন্যটি মিলে না। আমি বলি, নদী তার সত্তা নিয়ে আপন গতিতে বহমান। নিউজিল্যান্ড সরকার তাদের নদীগুলোকে মানুষের সম্মান দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মতোই নদীর আচরণকে কোনো সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলা যায় না।

৪০-৫০ বছর আগে এ দেশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আমাদের বলা হতো মাছে-ভাতে বাঙালি। চুলায় চাল ফুটতে দিয়ে বাড়ির আশেপাশে ছোট খাল বা নালা থেকে কই, পুঁটি, বাইম এনে রান্না করা হতো। মাছ এতটাই সহজলভ্য ছিল তখন। এখন চিত্র পাল্টে গেছে। নদী তার নাব্যতা হারাচ্ছে। খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে মাছ তার বিচরণভূমি খুঁজে পাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হলো, যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন হয় না কিন্তু অসময়ে প্রচুর বৃষ্টি।

কালবৈশাখী বাড়ির নির্দিষ্ট সময় আছে, তখন মাছের প্রজননের উৎকৃষ্ট সময়। ডিম থেকে পোনা বের হওয়ার জন্যেও বৃষ্টি প্রয়োজন। ইকোসিস্টেম অনেকাংশেই বৃষ্টির ওপরে নির্ভরশীল। এমনকি ফুল ফোটাও নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর।

আমাদের দেশ জোয়ার-ভাটার দেশ। এ নিয়ে তো ঐতিহাসিক ঘটনা আছে-মোঘলরা বাংলাদেশ কখনো দখল করতে পারে নি। সম্রাট আকবর তার ছেলেকে একবার পাঠালেন বাংলা দখল করতে। সেনাপতিসহ সম্রাটপুত্র বজরা নিয়ে রওনা হলেন। বাংলায় এসে পৌঁছলেন। বিকেলবেলা তিনি বজরায় বসে আছেন। বাতাস বইছে। চারদিকের সবুজ প্রকৃতি দেখে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে ভাবছেন, এই দেশ দখল করতে হবে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ করলেন, পানির প্রবাহ উল্টো দিকে! সেনাপতিকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি বলল, এখানকার নিয়মই এরকম-রাতে যেদিকে শ্রোত থাকে সকালে তার বিপরীতে চলে যায়। সম্রাটের পুত্র নির্দেশ দিলেন, এখানে আর একমুহূর্তও না!

এই জোয়ার-ভাটা সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে। অন্য দেশের বিশেষজ্ঞ এখানে এসে ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। তাই আমাদের উন্নয়ন আমাদের দেশের মানুষকেই করতে হবে। ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি এবং বৃষ্টি-এই উৎস তিনটি সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে যেন এগুলো আমরা রক্ষা করতে পারি। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নিয়ে কাজ করলে হবে না।

আমাদের দেশে এক টন মালামাল সড়ক পথে এক কিলোমিটার পরিবহন করতে খরচ হয় ছয় থেকে সাত টাকা। ট্রেনে হয় তিন টাকার মতো আর নৌপথে ৯০ থেকে ৯৫ পয়সা মাত্র। তাই অন্য দেশের সাথে আমাদের নদীর অববাহিকাভিত্তিক সৃষ্টি পরিকল্পনা করতে হবে। তাহলে নদীতে সারাবছর পানির পরিমাণ ঠিক থাকবে। নদীভাঙন হবে না। নদীপথে জাহাজ চলাচল বাড়বে।

প্রকৃতি চলে তার নিজস্ব নিয়মে। আমরা প্রকৃতির নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাই। এজন্যেই সমস্যা দেখা দেয়। তবে আমরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং সমাধানগুলোও জেনেছি। তাই তরুণদের বলব, সচেতন হও। প্রকৃতিকে ভালবাসো। আর তোমাদের জ্ঞানের ভিত্তিটা শক্ত করো, এর বিকল্প কিছু নেই।

বিয়েতে অপচয় ও ঋণ যত বেশি সুখ ও স্থায়িত্ব তত কম



বিয়ে। জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সামাজিক বুননকে ভারসাম্যপূর্ণ আর সুসংহত করে রাখতেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি মেনে চিরাযত এক চুক্তি, এক বন্ধন। যুগ যুগ ধরে যা ছিল পরিবারের আপনজনদের নিয়ে ঘরোয়া এক আয়োজন, তা-ই এখন পরিণত হয়েছে অপচয় ও জৌলুসের রমরমা প্রদর্শনীতে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে পৃথক শিল্প পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। মানুষকে বিলাসবহুল বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহিত করাই এর লক্ষ্য। চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন এবং বিয়ের ম্যাগাজিনগুলো যতই বলুক-বিয়ের অনুষ্ঠান হতে হবে রূপকথার মতো শানশওকতে পূর্ণ ও আলো ঝলমলে, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা কিন্তু বলছেন ভিন্ন কথা।

অপচয় ও ঋণ থেকে বাঁচুন কমবে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা

তিন হাজার দম্পতির ওপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল হলো, যে বিয়ের অনুষ্ঠানের বাজেট যত বড়, সেই দম্পতির সংসার জীবন তত সংক্ষিপ্ত। কল্পনাকে হার মানায় যেসব জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের উৎসব, তার অধিকাংশেরই করুণ পরিণতি ঘটে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

গবেষণাটি করেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিজাপুরের লি কুয়ান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি-বিষয়ক অধ্যাপক এড্রু ফ্র্যাংলিস-ট্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হুগো এম মিয়ালন।

অনেকের সাধ-ঋণের অর্থে হলেও বিয়েতে করা চাই সব আয়োজন। এরপর সৃষ্টি হয় ঋণ পরিশোধের মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও দুশ্চিন্তা, যা দাম্পত্য অশান্তি-এমনকি বিচ্ছেদের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

অধ্যাপক এড্রু ফ্র্যাংলিস-ট্যান ও অধ্যাপক হুগো এম মিয়ালন-এর মতে, গত ৫০ বছরে বিশ্বজুড়ে বিয়ে-কেন্দ্রিক যে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে তার মূল কথাই হলো ‘ব্যয় করো আর ব্যয় করো’।

১৯৫৯ সালে আমেরিকান ম্যাগাজিন ব্রাইডস-এর মতে, বিয়ের আগে দুমাসের প্রস্তুতিই ছিল যথেষ্ট। ৯০-এর দশকে এই বাস্তবতা বদলে গেল-১২ মাসের একটানা প্রস্তুতিও যেন মনের মতো অনুষ্ঠানের জন্যে আর যথেষ্ট নয়।

হীরার আংটি = চিরদিনের অশান্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পাশ্চাত্যে মাত্র ১০% বিয়েতে হীরার আংটির দেখা মিলত। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ডি বিয়ার্স নামক হীরা কোম্পানি স্লোগান চালু করে ‘ডায়মন্ড ইজ ফরএভার’ বা ‘হীরা চিরদিনের’। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় বিয়েতে হীরার আংটি দেয়ার চল।

২০১২ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে উপলক্ষে হীরার আংটি বিক্রি হয়েছে সাত বিলিয়ন ডলার বা ৫৯ হাজার পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যমানের। সময় যত গড়িয়েছে, সারা বিশ্বে বহুজাতিক কোম্পানির বাহারি বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের মনে এ ধারণাই পোক্ত করেছে-হীরা ছাড়া বিয়ে পরিপূর্ণ হয় না বা হীরা বিয়ের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করে।

অথচ এস্ট্রলজি গবেষণার ফলাফল হলো, ৯৫% বিয়েতে হীরকের প্রভাব অশুভ। প্রতিটি পাথরের কিছু দ্রব্যগুণ থাকে যা ব্যক্তির মানসিকতা ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। হীরকের মনোদৈহিক প্রভাব হলো, তা অহম বৃদ্ধি করে এবং পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রমাণ-পাশ্চাত্যে বিয়েতে হীরার আংটি অপরিহার্য এবং সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি।

বিয়ে ৥ সামাজিকতার নামে যত অবিদ্যা

আমাদের দেশেও বিয়ের সামাজিকতা এতটাই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছে যে, শুধু একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে পান-চিনি/এনগেজমেন্ট, আকুদ, মেহেন্দী ও সংগীত, দুটো গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌ-ভাত ইত্যাদি নামে কমপক্ষে সাত-আটটি অনুষ্ঠানের আয়োজন যেন বাধ্যতামূলক। যার সামর্থ্য নেই, তাকেও ধারকর্জ করে জোগাতে হয় এসব অনুষ্ঠানের অর্থ।

পোশাক, অলংকার, কমিউনিটি সেন্টার, খাবার, প্রি-ওয়েডিং পোস্ট ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, অন্দরসজ্জা-সবকিছুরই মূল্য উর্ধ্বমুখী। কারণ মানুষের চাহিদা বাড়ছে, যুক্ত হচ্ছে নানারকম ফরমেশ্যন। সমাজে মুখ রক্ষার জন্যে ব্যাংক ঋণ নিতেও কারো আপত্তি নেই।

হালে যোগ হয়েছে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। অতিথিদের নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে মনোরম কোনো স্থানে গিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। এজন্যে কোটি টাকাও খরচ করতে পিছপা হচ্ছে না উৎসাহীরা। চারপাশে দেখা যে-কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে যেতে পরিবারগুলো যেন আজ উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে শুভ একটি কাজের সূচনা হচ্ছে অপচয় অথবা ঋণ ও কিস্তির মতো অভিশাপের মধ্য দিয়ে।

নায়ক-নায়িকা ও ধনকুবেরদের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে সবাই প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, সেলিব্রিটিদের এসব উৎসব-আয়োজন এক ধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, যার আড়ালে থাকে পণ্যের প্রচার।

বিয়ের খরচ সীমিত হলো উজবেকিস্তানে

২০১৮ সালে উজবেকিস্তান সরকার সে-দেশে আইন করে বিয়েতে অতিরিক্ত খরচে নিষেধাজ্ঞা এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৫০ জনের বেশি অতিথিকে দাওয়াত দেয়া যাবে না। বিয়ের বহরে তিনটির বেশি দামি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

রয়টার্স-এর মতে, সেখানে বিয়ের সময় মধ্যবিত্ত একটি পরিবার প্রায় ২০ হাজার ডলারের মতো খরচ করে, যেখানে দেশটির গড় আয় ১০০-৩০০ ডলার মাত্র। বিয়ের অতিরিক্ত খরচ সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের থেকে ধার হিসেবে নেয়া হয়। এই ঋণের টাকা পুরো পরিবার বছর জুড়ে পরিশোধ করে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজোয়েভ উচ্চাভিলাসী বিয়েকে তিরস্কার করে বলেন, ‘বিয়ে-সংক্রান্ত ঋণের এ অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে পরিবারের পঞ্চাশোর্থ অর্ধেকেরই মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের কারণে।’

প্রয়োজন ও প্রদর্শনীর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন

পরিবার গঠন ও পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারের আনুষ্ঠানিক রূপই হলো বিয়ে। তাই বিয়েতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবার-পরিজনের উপস্থিতি, শুভ কামনা ও দোয়া বন্ধনকে দৃঢ় করে।

যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী চার্লস কেসলার-এর মতে, সেই অঙ্গীকারই সুদৃঢ় যা মানুষ জনসমক্ষে উচ্চারণ করতে পারে। আমরা যখন অনেকের মাঝে কোনো প্রতিজ্ঞা করি বা সিদ্ধান্তের কথা জানাই, তা আমাদের দায়িত্ববোধ বাড়ায় এবং লেগে থাকার সামর্থ্য জোগায়।

তবে প্রয়োজন ও প্রদর্শনীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে। সামাজিকতা ও ঐতিহ্যের নামে ভোগবাদী পণ্যদ্রব্যের শ্রোতে গা ভাসালে তা শুধু দুর্দশাই বয়ে আনবে।

করণীয়

- উভয়পক্ষ মিলে বিয়েতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন।
- বিয়ের অনুষ্ঠানকে ফটোগ্রাফারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখুন। একে ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও সেলফিসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করবেন না।
- আত্মীয়স্বজন ও অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময়ে আন্তরিক হোন। সব শ্রেণির অতিথিকে একই ব্যবস্থাপনায় খাবার পরিবেশন করুন।
- খাবারসহ সবরকম অপচয় সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিয়ে ও এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে গিফট দেবেন না, নেবেনও না। আনন্দিতচিত্তে যাবেন, তৃপ্তি নিয়ে থাকবেন এবং প্রাণভরে দোয়া করবেন।

সচেতন হোন

মিডিয়া ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিকতাকে তুলে ধরে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে। বিয়েকে চিত্রিত করে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, বিয়ের আরেক নাম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পরিবারের প্রতি, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি এবং সমাজের প্রতি।

মনে রাখবেন, বিয়ের অনুষ্ঠান হলো দায়িত্বপূর্ণ দীর্ঘ যাত্রার প্রথমদিন। তাই অহেতুক ঠাটবাট দেখিয়ে একে অপরের সম্পর্কে অযৌক্তিক প্রত্যাশা তৈরি করবেন না। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে থাকুক সততা ও দায়িত্ব-সচেতনতার ছাপ। ঋণ ও অপচয়ের ফাঁদ থেকে বাঁচুক প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি পরিবার।

তথ্যসূত্র : বিবিসি নিউজ ১৬ মার্চ ২০১৮

হাফিটন পোস্ট ২১ ডিসেম্বর ২০১৪

সাইকোলজি টুডে ১ ডিসেম্বর ২০১৪

হাজারো প্রশ্নের জবাব পর্ব ৩ ৥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

এ কোর্সের শিক্ষা জীবনের অনন্য অর্জন

শায়লা রহমান তিথি



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাকে যা দিয়েছে তা আমার জীবনের এক অনন্য অর্জন। কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। আমার ছোট ভাই কয়েক বছর আগে এ কোর্স করেছিল। নিয়মিত মেডিটেশন

চর্চা করে সে তার পেশা ও ব্যক্তিগত জীবনে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে। কোয়ান্টামের প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস দেখে খুব অবাক হতাম।

১৩ বছর ধরে আমি মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছি। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে কোনো ওষুধে কাজ হতো না। একবার ব্যথা শুরু হলে টানা কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হতো। এর সাথে ছিল ঘুমের সমস্যা। উচ্চমাত্রার ওষুধ খেয়েও ঘুম হতো না। ঘুম হতো না বলে আবার মাথাব্যথা। এর ফলে হতাশা, বিষাদ আর নানা দৈহিক জটিলতায় ভুগছিলাম।

কলকাতার ডাক্তার বললেন, আপনি একজীবনে অনেক ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন। এখন ওষুধ বাদ দিন, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপন বদলান। সে-দেশে দেখেছি খোলা মাঠে বহু মানুষ একসাথে বসে মেডিটেশন করছে। আমার এত ভালো লাগল দেখে!

এরপর এ কোর্সে এলাম। প্রথমদিন বাসায় ফিরেই ঘুমের ওষুধ ফেলে দিলাম। গত তিন রাত আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে। গুরুজীর আলোচনা শুনে বিশ্বাস হচ্ছিল যে, আমার ঘুম হবেই। তাছাড়া আমার মাথাব্যথাও নেই।

[সাংবাদিক ও শিশু সাময়িকী 'ঝুমঝুমি'-র সম্পাদক। ৪৬৩ ব্যাচ]

মনে হচ্ছে জীবন অপ্রতিরোধ্য

সৈয়দ দারুল ইসলাম



১০ বছর ধরে আমার কোমর ও মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা। পাইলসের সমস্যা ও ব্যথার কারণে আমার দুবার অপারেশন করতে হয়েছে। একবার চেয়ারে বসলে সহজে উঠতে পারতাম না। অনেক চিকিৎসা

করিয়েছি কিন্তু কোনো ওষুধ আমাকে সুস্থ করতে পারে নি। আমার জীবন থেকে সকল আনন্দ হারিয়ে গিয়েছিল।

কোর্সে এসে মেডিটেশন করে দ্বিতীয় দিন থেকে আমার কোমরে কোনো ব্যথা নেই। এখানে এসে আমার মনে হয়েছে-জীবন অপ্রতিরোধ্য। জীবন মানে সফলতা আর আনন্দ। গুরুজী আমাদের সফল হওয়ার পথটাই দেখিয়ে দিয়েছেন। কোয়ান্টামের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

[ব্যবসায়ী। ৪৬২ ব্যাচ]

শিখেছি কীভাবে ইতিবাচক কথা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করা যায়

ডা. রুকসানা কবির



চিকিৎসক হিসেবে কোন বিষয়ে আমি ক্যারিয়ার গড়ব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। আমার বড় কোনো লক্ষ্যও ছিল না। কোর্সের আলোচনা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি। মেডিটেশন করে আমার মনছবি সুস্পষ্ট হয়েছে।

মেডিকেল কলেজে আমরা রোগ সম্পর্কে পড়ি, রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে জানি। কিন্তু রোগীর ওপর ডাক্তারের নেতিবাচক কথার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কীভাবে ইতিবাচক কথা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়, এ নিয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের নেই। এই শিক্ষাই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে পেয়েছি।

[মেডিকেল অফিসার, সার্জিক্যাল ফার্মিগি সেন্টার, চট্টগ্রাম। ৪৬৩ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছি

মাহমুদা আক্তার

এবছর আমার আট জন আত্মীয় মারা গেছেন। একেকটা মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার মনে হতো, খুব তাড়াতাড়ি আমিও মারা যাব। অন্যের অসুখ হলে আমি ভয় পেতাম এবং মনে হতো, সেই রোগের সব লক্ষণই যেন আমার মাঝে আছে। সবকিছু নিয়েই আমার ভয় কাজ করত।

এ-ছাড়াও আমার সর্দি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। পানি ধরলেই ঠান্ডা লাগত। আমার তিন বছরের সন্তানের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারতাম না। সংসারের কাজ করতে পারতাম না। ওষুধনির্ভর জীবন ছিল আমার। মনে হতো, আমার মতো একেজো মানুষ পরিবারের জন্যে বোঝা। অসুস্থতার জন্যে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় সময় কাটছিল।

কোর্সে এসে আমি মৃত্যুভয়কে জয় করতে পেরেছি। এখানে দমচর্চা ও মেডিটেশন করে আমি ভালো আছি। এখন মনে হচ্ছে, নতুন জীবন পেয়েছি। ছোটবেলায় মায়ের কাছে যেরকম নিরাপদ বোধ করতাম, কোর্সে এসে আমি একইরকম নিরাপত্তা অনুভব করছি। এ চার দিনে আমি বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে আমি আরো ভালো থাকব।

[গৃহিণী। ৪৬২ ব্যাচ]

অশান্তির বিপরীতে শান্তির বিপ্লব ঘটিয়েছে কোয়ান্টাম

মো. জহিরুল ইসলাম



কোয়ান্টাম মেথড বইটি আমি পড়ি ১৯৯৩ সালে। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। সে-সময় আমি কোর্সটি করতে পারি নি। পরবর্তীতে ক্যাসেট সংগ্রহ করে আমি মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। আমার আজকের

যে অর্জন, তার প্রস্তুতি নিতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করেছে। কাজের সাথে মিশে যাওয়ার জন্যে প্রতিটি মানুষের মেডিটেশন চর্চা করা প্রয়োজন।

২০০৬ সালে আমি জাতিসংঘে কাজ করার সুযোগ পাই। কিন্তু সে-বছরই একটি দুর্ঘটনায় আমার পায়ের লিগামেন্টে সমস্যা দেখা দেয়। কর্মসূত্রে আমাকে বিদেশ চলে যেতে হয় এবং সেখানে ডাক্তার আমার রিপোর্ট দেখে বললেন, ব্যথা ভালো হলেও আমার পা কখনোই আগের মতো ভাঁজ করতে পারব না। কিন্তু আমি মেডিটেশনে সুস্থতার মনছবি দেখতে থাকি। সুস্থ হবো-এই বিশ্বাস আমার ছিল। মাস ছয়েক পর আমার পা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।

আমার স্ত্রী আগেই এ কোর্সে অংশ নিয়েছেন। এরপর থেকে আমাদের দুজনের বোঝাপড়া বেশ ভালো। চার দিন ক্লাস করে আমার উপলব্ধি-প্রশান্তি এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ হলো মেডিটেশন বা ধ্যান। বাংলাদেশে তরুণদের মাঝে অশান্তির বিপরীতে শান্তির বিপ্লব ঘটিয়েছে কোয়ান্টাম। তরুণরাই ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে এবং আমাদের দেশ এ ধ্যানচর্চার সুফল একদিন অবশ্যই পাবে।

[মানবাধিকার কর্মকর্তা, জাতিসংঘ। ৪৬২ ব্যাচ]

আমার দেশকে নিয়ে আমি এখন গর্ববোধ করছি

আফফান মাহবুব

আমি স্মার্টফোনে গেম খেলতাম। ইউটিউব ও নেটফ্লিক্স দেখতাম। এগুলো কীভাবে আমার ক্ষতি করবে তা আমি বুঝতে পারতাম না। টিভি দেখতে না পারলে আমার ভালো লাগত না। কিন্তু এখন আমি জানি, জীবনে বড় হতে



হলে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে। কোয়ান্টামে এসে আমি ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

আগে মনে হতো, আমি রোজগার করি না। তাহলে কীভাবে দান করব? কিন্তু কোয়ান্টামে এসে জানলাম, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, অন্যকে সাহায্য করাটাও দান। গুরুজীর আলোচনা শুনে নিজের দেশকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। আমি মনছবি তৈরি করেছি এবং আমার বিশ্বাস, আমি তা অর্জন করতে পারব।

[শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ঢাকা। ৪৬৩ ব্যাচ]

কোরআন ও হাদীসের সাথে কোর্সের বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক

মওলানা মো. সাকিব আল হাসান



আমার পরিচিত যারাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমি ইতিবাচক অনেক পরিবর্তন দেখেছি। এ কারণে আমি নিজেও কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে এসে আমার উপলব্ধি হলো—

গুরুজীর প্রতিটি আলোচনা কোরআন ও হাদীসের সাথে প্রাসঙ্গিক। আমি দীর্ঘদিন ধর্ম-বিষয়ক বয়ান করেছি, ওয়াজ করেছি, জুমার নামাজ পড়িয়েছি। কিন্তু নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার বাস্তবসম্মত কৌশল আমি জানতে পেরেছি কোর্সে এসে। মেডিটেশন করে এখন আমার নামাজের অনুভূতি অন্য সময়ের চেয়ে আলাদা।

কোর্সের আলোচনা শুনে আমি সোশ্যাল মিডিয়া ও স্মার্টফোনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। এ চার দিন আমি মোবাইল ফোন বন্ধ করে ক্লাস করেছি। স্মার্টফোনের প্রতি এখন আমার অনীহা কাজ করেছে। মনে হচ্ছে, কেন আরো আগে আমি কোর্স করতে এলাম না!

ইমাম, কাশিমপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহী। ৪৬২ ব্যাচ

শিক্ষার্থীদের মাঝে কোয়ান্টামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চাই

মাধবী দাস



একমাত্র সন্তানকে নিয়ে আমি সবসময় টেনশন করতাম। ক্ষতিকর সঙ্গ এবং অসহিষ্ণু অস্থির পরিবেশের কারণে এক ধরনের শঙ্কা কাজ করত আমার ভেতর। এ-ছাড়াও কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে আমি দিশেহারা

বোধ করতাম। জীবনে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ছোট ভাইয়ের পরামর্শে কোয়ান্টামে কাউন্সেলিং সেবা নিয়েছিলাম আমি। তখনই কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিই। কোর্সে এসে আমার অস্থিরতা কমেছে। আমি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো পরিস্থিতিতে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

১৭ বছর আগে আমি পায়ে আঘাত পেয়েছিলাম। পায়ের ব্যথার জন্যে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু এ চার দিন একটানা বসে থেকেও আমি কোনো ব্যথা অনুভব করি নি।

একজন শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি, ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করতে হবে। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে কোয়ান্টামের ইতিবাচক কথাগুলো আমি ছড়িয়ে দিতে চাই। তাহলে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে।

[সিনিয়র শিক্ষক, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। ৪৬৩ ব্যাচ]

যা শিখলাম তা সারাজীবনের জন্যে অনুসরণীয়

নির্ব্বর চৌধুরী

২০১৫ সালে আমার বাবার ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে। পরবর্তীতে তার মস্তিষ্কে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে। বাবাকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখাটা খুবই কষ্টদায়ক ছিল আমার জন্যে। তিনি চলে গেলে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ি। কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল, আমি কাজের মাঝপথে হাল ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ আমি বাবাবরই জীবনের প্রতি ইতিবাচক ছিলাম, কাজ ভালবাসতাম।

কোয়ান্টামে এসে আমি বিম্মিত হয়েছি। শুধু ইতিবাচক কথা দিয়ে মন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়—তা চার দিনের ক্লাস করে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমার এসিডিটির সমস্যা ছিল। কিন্তু মেডিটেশন করে এ সমস্যা আর অনুভব করছি না। এ কোর্সে আমরা যা শিখলাম, তা সারাজীবনের জন্যে অনুসরণীয়। আমি বিশ্বাস করি, আমরা প্রত্যেকে যদি ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি লালন করতে পারি, তাহলে পুরো পৃথিবী বদলে দেয়া সম্ভব।

[সঙ্গীতশিল্পী, হেড অব প্রোগ্রাম, রেডিও ৭১। ৪৬৩ ব্যাচ]



রাগ নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র পেয়েছি কোর্সে এসে

জাবির হোসেন

অল্পতেই আমি রেগে যেতাম। রেগে গেলে আমার মাথার তালু জ্বলত, ঘাড় ব্যথা করত। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতাম না। একপর্যায়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমার উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে এবং সারাজীবন ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে।

আমার সমস্যার কথা শুনে আমার বড় ভাই আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে বললেন। তিনি ২০০৭ থেকে আমাকে কোর্স করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন। এবার কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমি ঢাকায় এলাম। কোর্সে এসে সুস্থ হওয়ার আশা পেলাম। প্রথমদিন মেডিটেশনে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক কল্পনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। রাতে লক্ষ করলাম, সারাদিনে আমার ঘাড় ব্যথা করে নি। মাথার তালুতেও কোনো যন্ত্রণা নেই।

রাগের আলোচনায় গুরুজী বললেন—রাগ পুরুষ বা স্ত্রীর ভূষণ নয়, রাগ হচ্ছে পশুর ভূষণ। একথা শুনে নিজের আচরণের জন্যে অনুশোচনা হলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আর রাগ করব না। কোর্সে এসে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র পেয়েছি।

[প্রধান শিক্ষক, অক্সফোর্ড মডেল স্কুল, চাঁদপুর। ৪৬২ ব্যাচ]



সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস পেয়েছি

ফারহানা আক্তার



২০১৭ সালে আমার এলাজির সমস্যা ধরা পড়ে। ডাক্তার আমাকে হাত পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিলেন। বার বার হাত ধোয়ার অভ্যাস তখন থেকেই। লক্ষ করলাম, আমি অনেক সময় নিয়ে হাত ধুচ্ছি।

২০১৮ সালে বুঝতে পারলাম, আমি শুচিবায়ু রোগে ভুগছি। খেতে পারতাম না, মনে হতো খাবারে ময়লা। টয়লেট যাওয়ার ভয়ে পানি পান করতাম না। জিনিসপত্র কাউকে ধরতে দিতাম না। অন্যের কোনো কিছুও স্পর্শ করতাম না। সবার প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল।

একবার রিকশা থেকে আমার ছোট ভাই পড়ে গেল। আমি পাশেই বসে ছিলাম, কিন্তু স্পর্শ করার ভয়ে তাকে ধরি নি। অথচ ভাইকে আমি খুব স্নেহ করি।

কোর্সে আসার আগে আমি চার দিন চার রাত বাথরুমে ছিলাম। নিজের সব জিনিসপত্র ধুয়েছি কিন্তু মনে হচ্ছিল ভালোভাবে পরিষ্কার হচ্ছে না। ভাবতাম, আমি পাগল হয়ে গেছি। আর কোনোদিন ভালো হবো না। মরে যেতে ইচ্ছা করত। আমাকে দেখে আমার পরিবারের মানুষগুলোও কষ্ট পেত।

কোর্সে প্রথমদিন জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলাম যাতে কারো স্পর্শ না লাগে। গুরুজী আলোচনায় বললেন—সবসময় বলুন, আমি পারি আমি করব! একথা শুনে এবং মেডিটেশন করে আমি ইতিবাচক চিন্তা করতে পারছি। এখন কোনো কিছু স্পর্শ করতে সমস্যা হচ্ছে না। খেতেও পারছি। বিশ্বাস এসেছে, আমার পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব। এটা আমার জন্যে বিশাল প্রাপ্তি।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কুমিল্লা ডিগ্রিয়ারিয়া সরকারি কলেজ। ৪৬২ ব্যাচ]

শরতের আকাশের মতো ঝকঝকে মনে হচ্ছে নিজেকে

রোকসানা পারভীন



এসএসসি পরীক্ষার পর পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সংসার, দুই সন্তান নিয়ে আমি পড়াশোনা চালিয়ে গেছি। সম্প্রতি বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ায় মানসিকভাবে দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছিলাম আমি। সংসার, অফিস

কোনো কিছুই ভালো লাগত না। সবসময় আমার অস্থির লাগত। যত সময় গড়াচ্ছিল, জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছিলাম।

মনের ক্যানভাসে নতুন করে মনছবি আঁকব বলে কোর্সে অংশ নিয়েছি। কোর্স শেষে উপলব্ধি করলাম, মনের সব কালো মেঘ ধুয়ে গেছে। শরতের আকাশের মতো ঝকঝকে মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। লক্ষ্যের জন্যে নিরলস কাজ করার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছি।

[ক্যাশ অফিসার, ডাচ বাংলা ব্যাংক লি., নরসিংদী। ৪৬২ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে টাকা জমা করে আমরা এতিমদের সাহায্য করছি। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এই সাহায্য পাচ্ছে, তাদের মধ্যে মুসলমান কয়জন? আমরা কি মুসলমান এতিমদের সাহায্যে দানের পুরো অর্থটা ব্যয় করতে পারি না?

উত্তর : নবীজী (স) এবং পরবর্তীতে ইসলামের মনীষী যারা এসেছেন, তাদের জীবন ও কর্মে এমন সংকীর্ণতার পরিচয় কোথাও নেই। কোরআনে এতিম মিসকিনদের সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। কোথাও মুসলিম এতিম, মুসলিম মিসকিনের কথা বলা হয় নি। যাকাত, সদকা, দান-সবক্ষেত্রেই তা-ই।

মনে রাখবেন, আল্লাহর রসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার শিক্ষা হলো মানুষের কল্যাণ করো, সেটা ধর্মশ্রেণিগোত্র নির্বিশেষে। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ওমর (রা) বলেছেন, ‘ফোরাতে নদীর কূলে একটি বিভাগও যদি না খেয়ে মারা যায় আমি ওমরকে এজেন্সি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।’

আর নবীজীর (স) জীবনে আমরা দেখি-যার যখন অভাব, যার যা প্রয়োজন তাকে তিনি সেভাবে সাহায্য করেছেন। ধর্মের পার্থক্য কখনোই দান ও সেবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। অতএব সবসময় মনটাকে বড় করবেন। কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষাকে অনুসরণ করবেন। সংকীর্ণ চিন্তাচেতনার প্রশ্ন দেবেন না। তাহলেই আপনি সত্যিকারের মুসলমান হতে পারবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, আমরা জানার চেষ্টা করি না। কোনোকিছুর গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি না।

একজন মুসলমান হিসেবে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআনে নবীজীকে (স) অভিহিত করা হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন অর্থাৎ তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যে করুণাস্বরূপ। তাঁকে রহমাতুল্লিল মুসলিমিন বলা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমরাও যখন আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসতে পারব, তখনই নবীজীর (স) সত্যিকার অনুসারী হতে পারব।

নবীজীর (স) পরবর্তীকালে ইসলামের ইমামদের জীবনেও আমরা একই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ ও চর্চা দেখতে পাই। ইমাম আবু হানিফার কথাই ধরি। তিনি তখন বসরায় থাকতেন এবং তার এক প্রতিবেশী ছিল খ্রিষ্টান মুচি। প্রায় রাতেই সে মদ খেয়ে বউ পেটাত। বউয়ের চিৎকার কান্নাকাটি সব মিলে রীতিমতো হৈ-হুল্লা। বিরক্ত হয়ে প্রতিবেশীরা ভাবল, ইমাম সাহেব যখন আছেন এই মহল্লাতে, তার কাছে গিয়েই আমরা নালিশ করি। প্রতিবেশীদের নালিশ শুনে ইমাম আবু হানিফা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাকে বলে দেবো।

ইমাম সাহেব মুচিকে ডেকে বললেন, দেখ, মদ খেয়ে মাতলামি করা, বউ-পেটানো, এগুলো ঠিক নয়। এটা করবে না কখনো। মুচিও বলল, হুজুর, আর কোনদিন করব না। কিন্তু দেখা গেল রাতে আবার সেই একই অবস্থা। কারণ মাতাল ও মাদকাসক্তরা নেশার ঘোরে কতটা অমানুষ হয়ে ওঠে, সেটা তারা বোঝে নেশা কেটে যাওয়ার পর।

এদিকে প্রতিবেশীরা দেখল, ইমাম সাহেবকে বলে তো কোনো লাভ হলো না। তারা বসরার গভর্নরের কাছে গিয়ে নালিশ করল। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ এসে মুচিকে ধরে নিয়ে গেল।

ইমাম সাহেব এর কিছুই জানেন না। পরদিন ভোরবেলা যখন তিনি ফজরের নামাজ পড়তে যাচ্ছেন, শুনলেন মুচির বাড়ি থেকে মহিলার কান্নার শব্দ আসছে। ইমাম সাহেব থামলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি কাদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

ইমাম সাহেবের গলা শুনে মুচির বউ ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। একেবারে পায়ে পড়ে বলল, হুজুর, আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ঘরে খাবার কিছু নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি এখন কী করি? ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে তুমি ঘরে যাও, আমি দেখছি কী করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা যাচ্ছিলেন মসজিদে। মসজিদে না গিয়ে তিনি তখন বাসায় ফিরে এলেন। তার সহধর্মিণীকে বললেন, আমাদের প্রতিবেশী যে মুচি, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তার ঘরে কোনো খাবার নেই। ওদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করো। এই বলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন। নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে খাবার পাঠিয়ে দিলেন মুচির ঘরে। তারপর যখন সকাল হলো, তিনি গেলেন বসরার গভর্নরের দরবারে।

ইতঃপূর্বে বাগদাদের খলিফা তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কাজিউল কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা যেহেতু খলিফার অধীনে ন্যায়বিচার করতে পারবেন না, তাই তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি এবং এজন্যে তাকে পরবর্তীকালে অনেক ভোগান্তি সহ্য করার পর জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। যিনি প্রধান বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই তিনিই এবার নিজে থেকে বসরার গভর্নরের দরবারে গেলেন। কেন? কারণ তার প্রতিবেশী মুচির পরিবার অত্যন্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে!

গভর্নর তো তাকে দেখেই আসন ছেড়ে পড়ি-মরি করে ছুটে এলেন-‘হুজুর! আপনি এসেছেন আমার দরবারে, আমাকে তো ডাকলে পারতেন।’ কারণ এর আগে কয়েকবার তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি আসেন নি।

ইমাম সাহেব বললেন, দেখ, আমি নিজের জন্যে আসি নি। আমার এক প্রতিবেশী মুচি, তাকে তোমার পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে। সে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে মারপিট হুটগোল করে ঠিক, কিন্তু এখন তার বাড়িতে খাবার নেই। তার স্ত্রী-সন্তানেরা না খেয়ে আছে। এখন হয় তাকে ছেড়ে দাও, না হয় তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।

বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন! এত বড় একজন ইমাম। যাকে এর আগে আমন্ত্রণ জানানোর পরও তিনি কখনো গভর্নরের দরবারে যান নি, সেই তিনিই ওখানে গেছেন এক খ্রিষ্টান মাতাল মুচির ব্যাপারে সুপারিশ করতে!

আর সেই ইমামের অনুসারী হয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমরা যদি চিন্তা করি-এতিম কি হিন্দু, বৌদ্ধ নাকি মুসলমান-তাহলে এটা আমাদের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কী? এই সংকীর্ণতাই নানারকম হানাহানির জন্ম দেয়।

অতএব দান করবেন সবসময় মুক্তমনে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা। আর শুকরিয়া আদায় করবেন যে, ধর্মগোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রশ্ন : মাত্র গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম। একজন সফল ব্যবসায়ী হতে চাই। কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই। কীসের বা কীভাবে ব্যবসা করব, বুঝে উঠতে পারছি না। পরামর্শ দেবেন।

উত্তর : ব্যবসা নিয়ে রোমান্সিজমে ভুগবেন না। ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকুন। কীভাবে লোকজন ব্যবসা করে সেটা দেখুন তিন মাস। তারপর চিন্তা করুন, বাস্তবে ফুটপাত থেকে অর্থাৎ ছোট থেকে কীভাবে শুরু করতে পারেন। তাহলে আপনি পারবেন। আর বাবার টাকা নিয়ে যদি ব্যবসা শুরু করেন, কিছুদিন পরে আপনার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ প্রতিটি ব্যবসার কিছু গোমর আছে, আগে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। তবেই আপনি ব্যবসায় সফল হবেন।

আর বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সবসময় ছোট ছোট উদ্যোগ দিয়ে শুরু করতে হয়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আমরা শুরু করেছিলাম সাড়ে ১০ ফিট বাই সাড়ে ১২ ফিটের ছোট একটা রুম থেকে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমাদের সব কার্যক্রমের পরিসর বেড়েছে। আসলে তা-ই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, শূন্য থেকে শুরু করে যে কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন : আমার মা আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলেন। আমাকে বলেন-‘ফেল করবি’। তাই আমি সবসময় ফেল করি। এ থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর : মা-বাবা সম্পর্কে কোনো রাগ অভিমান ক্ষোভ পুষে রাখবেন না। আর মা হয়তো রাগের মাথায় বলছেন ‘ফেল করবি’, কিন্তু সেজন্যেই যে আপনি ফেল করেন, তা নয়; বরং ভেবে দেখুন-পরীক্ষার আগে যথাযথ প্রস্তুতি আপনার হয় নি বলে আপনি ফেল করেন কিনা।

তাই এখন থেকে আপনার কাজ হচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে ইতিবাচক থাকা এবং পড়াশোনায় আরো বেশি মনোযোগী হওয়া। আপনি আপনার মাকে পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন। কারণ অন্যকে বদলানো যায় না, বদলাতে হয় নিজেকে।

অতএব যখনই আপনার মা কোনো নেতিবাচক কথা বলবেন, আপনি মনে মনে তওবা তওবা বলুন। একে মায়ের দোয়া বলে মনে করুন। মিষ্টি হেসে মাকে বলুন, মা! তুমি দোয়া করো, যাতে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি।

এ মাসের অটোসাজেশন

সেবার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা থেকে আমি বিরত থাকব। যখন যার প্রয়োজন তার সেবা করব।

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগ আমাদের আশাবাদী করে



১৪৯ তম শত আজীবন রক্তদাতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব কবির বিন আনোয়ার

বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সামাজিকতা এবং ভালবাসার বন্ধন হারিয়ে যাচ্ছে। এটাকে পুনর্জাগরণের চেষ্টাও তারা শুরু করেছে। এজন্যে তারা বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। অথচ আমাদের দেশের মানুষের সেবা করার মানসিকতা বরাবরই ছিল, এখনো আছে। স্বেচ্ছা রক্তদাতারা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ করে যখন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মতো মানবিক উদ্যোগ দেখি তখন খুব আশা জাগে। এ কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই।

২০ অক্টোবর ফাউন্ডেশন আয়োজিত শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৪৯ তম আয়োজনে রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার। এ আয়োজনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৪৮ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম। তিনি বলেন, অন্যের উপকার করতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। অথচ নিজের স্বার্থচিন্তাকে জীবনের উপভোগ্য বিষয় মনে করে অনেকে। বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। কীভাবে অন্যের উপকার করতে পারি-এই ভাবনাটি যখন একজন মানুষের মধ্যে থাকে, তার সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, সে তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতে পারে। কারণ আমরা আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব।

মুমূর্ষের সেবায় যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, তারা নিঃস্বার্থভাবেই এ-কাজ করছেন। এ কারণেই তারা জীবনকে উপভোগ করতে

পারছেন। আমি মনে করি, অন্যদের তুলনায় তাদের মানসিক শান্তিটা অনেক বেশি।

প্রোগ্রাম দুটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ১৭০ জনকে সম্মাননা সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও ট্রেস্ট প্রদান করা হয় এতে। দুটি আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।



১৪৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শামস-উল ইসলামের কাছ থেকে ট্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

হ্যান্ডবলে বালক ও বালিকা উভয় গ্রুপে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল



৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো ৪৮ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯। এবছর জাতীয় পর্যায়ের ম্যাচগুলোর ভেন্যু ছিল সিলেটের আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স। আঞ্চলিক পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলোকে পরাজিত করে এ প্রতিযোগিতায় বালিকা ও বালক উভয় গ্রুপে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

উল্লেখ্য, বালক হ্যান্ডবল দল টানা চতুর্থ বারের মতো ও সর্বমোট ষষ্ঠ বারের মতো জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ঢাকায় আইনজীবীদের অংশগ্রহণে সুস্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার



২৩ অক্টোবর ঢাকায় আইনজীবী সমিতির জিল্লুর রহমান অভিনেত্রীরায়ে সুস্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইনজীবী সমিতির ৩৫০ জন আইনজীবী অংশ নিয়েছেন।

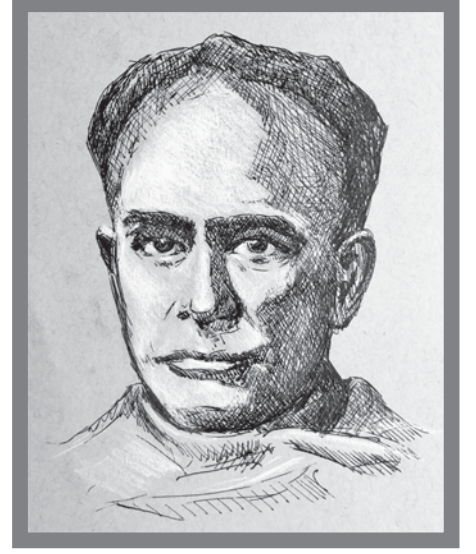
এ সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ডায়াবেটিস নিরাময় ও প্রতিরোধে আমাদের করণীয়। এতে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান। আলোচনায় ডায়াবেটিস প্রতিরোধে নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ জীবনচার অনুসরণ ও পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

১ নভেম্বর থেকে কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত ও রক্ত উপাদানের প্রসেসিং খরচ

রক্তের মান নিয়ন্ত্রণে কোয়ান্টাম ল্যাব সবসময় আপসহীন। রক্তের শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান, প্রযুক্তি ও ব্লাডব্যাগের খরচ গত ১০ বছরে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। তাই বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহের জন্যে রক্ত ও রক্ত উপাদানগুলোর ১ নভেম্বর থেকে প্রসেসিং খরচ হালনাগাদ করা হয়েছে—

উপাদান	প্রসেসিং খরচ
হোল ব্লাড	১,০৫০/-
রেড সেল কনসেন্ট্রেট	৯৫০/-
ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা	১,০৫০/-
প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট	১,১৫০/-
ফ্রেশ প্লাজমা	১,১৫০/-
প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা	১,১৫০/-
প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা	১,১৫০/-
ক্রায়োপ্রিসিপিটেট	১,১৫০/-
প্রোটিন সলিউশন	৯৫০/-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানুষকে দেখেছেন মানুষ হিসেবে



২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ – ২৯ জুলাই ১৮৯১

‘গুণমাণ হইলেই মানে সব ঠাঁই
গুণহীনে সমাদর কোনোখানে নাই’

‘অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে
সমাজের অমঙ্গল’

- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তার জন্ম। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা ভগবতী দেবী।
- ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্যে ১৮৩৯ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে তাকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেয়া হয়।
- বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে যতি চিহ্নের প্রবর্তক তিনি।
- নারীশিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনস্বীকার্য। কলকাতার বেথুন কলেজ তার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলেও তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বিদ্যাসাগর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে বলেন, ‘দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজৈয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।’
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেন, He has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and heart of a Bengali mother.

কলকাতার রাস্তা কুয়াশায় ঢেকে গেছে। দুহাত দুরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুকিয়া স্ট্রিটের একটি বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। বিয়ে দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় জমেছে। বাইরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। বিয়ে নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা সতর্ক। যে-কোনো সময় শুরু হতে পারে গণ্ডগোল।

কুয়াশা এবং লোকের ভিড় ঠেলে অতিথিরা আসছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার আমন্ত্রণেই অতিথিদের আগমন। বিয়ের যাবতীয় আয়োজন করেছেন তিনি। ঐতিহাসিক এই বিয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দু বিধবা নারীর ভাগ্য বদলাতে যাচ্ছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো মধ্যরাতে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঈশ্বরচন্দ্র।

দিনটি ছিল ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। সেদিন প্রথম হিন্দু বিধবা বিবাহ হয়। বিয়ের বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কনে কালীমতি দেবী। চার বছর বয়সে কালীমতির একবার বিয়ে হয়েছিল। ছয় বছর বয়সেই সে বিধবা হয়।

নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পরবর্তী ১২ বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০ জন বিধবা কন্যার বিয়ে দেন। এসব বিয়ের অধিকাংশের ব্যয়ভার বহন করেন তিনি নিজেই। বিধবা বিবাহের প্রচলন সমাজকে শোষণ নিপীড়ন ও অনাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকল্প। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাজিত নহি।’

নীতির প্রশ্নে তিনি আপসহীন

একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তার ছেলে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধবার সাথে বিয়ে দেবেন। তাতে ছেলেরও আপত্তি নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ঈশ্বরচন্দ্রের মা।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কথিত আছে, মা ডেকেছিলেন বলে একবার তিনি দামোদর নদীতে কোনো নৌকা না পেয়ে সাঁতরে পার হলেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করতে রাজি নন ঈশ্বরচন্দ্র। বললেন, ‘তুমি আমার মা। তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু নীতি লঙ্ঘন করতে পারি না, সত্যকে লঙ্ঘন করতে পারি না। সত্যই হচ্ছে আমার কর্ম।’ মায়ের সমস্ত দিব্য লঙ্ঘন করে ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেকে বিধবার সাথে বিয়ে দিলেন।

তিনি কখনো তোষামোদ পছন্দ করতেন না। একবার তার মেয়ে-জামাই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন। অধ্যক্ষ হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সবারকম গুণ তার ছিল। কলেজের কাজকর্ম সবই ঠিক চলছিল। কিন্তু বছর শেষে একটি খরচের হিসাব মিলল না এবং অধ্যক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ‘তোমার টাকার প্রয়োজন ছিল, আমাকে বলতে। তুমি ভেবেছ যে, কলেজ যেহেতু শ্বশুর মশায়ের, যা হচ্ছে তা-ই হবে।’ এই বলে তাকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করলেন। এমনই দৃঢ় সংকল্পের মানুষ ছিলেন তিনি।

মানুষের সেবায় সদা তৎপর

১৮৬৬ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা যাচ্ছিল। কিন্তু সেবা-বত্নের জন্যে কেউ এগিয়ে আসছিল না।

বিদ্যাসাগর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আনলেন। লোকজনকে খাওয়ানোর জন্যে সাধ্য অনুযায়ী তার গ্রামে লঙ্গরখানা খুললেন। সেখানে ১২ জন মানুষ দিনরাত রান্না করত। আর এই খাবার পরিবেশনে থাকত আরো ২০ জন।

একবার এক কিশোরী এসেছে এই লঙ্গরখানায়। রুক্ষ শুষ্ক তার চুল। মলিন চেহারা। খাবারই জোটে না, চুলে দেয়ার তেল পাবে কোথায়? ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে কিছু বলতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে। নিচু জাতের বলে তাকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয়!

ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েটির কাছে গেলেন। তাকে পেটপুরে খাওয়ালেন। তারপর মেয়েটির রুক্ষ চুলে নিজ হাতে তেল দিয়ে দিলেন। এই দৃশ্য চারপাশের মানুষ অবাক হয়ে দেখল। অনেকেই ভাবল, ঈশ্বরচন্দ্রের জাত চলে গেছে! তিনি অপবিত্র হয়ে গেছেন। কিন্তু এসবে তার কোনো পরোয়া ছিল না।

তখনকার দিনে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ খুব বেশি ছিল। একই বাড়ির খাবার খেতে উঁচুবর্ণের হিন্দুদের ঘোর আপত্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, ‘যিনি ক্ষুধার্ত তিনি লঙ্গরখানায় খেতে পারবেন, এখানে কোনো জাতপাত চলবে না।’ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন তিনি। শুধু বিদ্যার সাগর নন, ছিলেন মানবতার সাগর।

আমরা পারব, বাঙালি পারবে

তখনকার দিনে ভারতবর্ষে শীর্ষস্থানীয় কলেজ ছিল সংস্কৃত কলেজ। সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়ার সুযোগ পেত। এই কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র অন্য বর্ণের ছাত্রদের লেখাপড়ার অধিকার নিশ্চিত করেন।

তার আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটারির সাথে মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। এর আরেকটি অন্যতম কারণ-ইংরেজরা মনে করত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর মতো সামর্থ্য বা জ্ঞান কোনোটিই বাঙালির নেই। তাই তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে সকল শিক্ষক ছিলেন বাঙালি। ১৮৭৯ সালে এটি পরিণত হলো কলকাতার প্রথম সারির কলেজে।

লোকাচার নয়, সংকর্মেই যার বিশ্বাস

সমাজে অনেক সংস্কার আছে যার পেছনে কোনো ধর্ম নেই, আছে লৌকিকতা। এই লোকাচারকে তিনি সবসময় অগ্রাহ্য করেছেন। তার মতে-সংকর্মই হচ্ছে ধর্ম, সেবাই হচ্ছে ধর্ম।

বিদ্যাসাগর শুধু কৃতী বাঙালিই ছিলেন না, ছিলেন যথার্থ ও আলোকিত মানুষ। তার সততা, দৃঢ়তা ও নীতিনিষ্ঠার আলো হাজার বছর পরও উত্তর প্রজন্মকে জোগাবে সাহস। দেবে অনুপ্রেরণা। সব যুগে সব কালে তিনি একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।